বাংলাদেশে উন্নয়ন ভাবনা : তত্ত্ব ও বাস্তবতা

ড: মো: মোয়াজ্জেম হোসেন খান
অধ্যাপক
অর্থনীতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী-৬২০৫

০৮-১০ - ই জানুয়ারী ২০১৫, তারিখে ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউট, রমনা, ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ১৯-তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে উপস্থাপিত

০৮-১০ - ই জানুয়ারী ২০১৫/২৫-২৭ - ই পৌষ ১৪২১
ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউট, রমনা, ঢাকা

বাংলাদেশে উন্নয়ন ভাবনা : তত্ত্ব ও বাস্তবতা

ভূমিকা

আমাদের দেশের উন্নয়ন বিষয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে, বর্তমানে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। উন্নয়ন যে এখানে হয় নি তাও বলছি না; উন্নয়ন অবশ্যই হয়েছে, তবে কাংখিত মাত্রায় হয় নি, টেক্সই উন্নয়ন বলতে যা বোঝায় তা হয় নি। প্রধান খাদ্য শস্য ধানের কথাই ধরা যাক, ১৯৭২ সালের প্রায় এক কোটি টনের যায়গায় ২০১৩ সালে এর উৎপাদন চালের আকারে ৩.৫৫ কোটি টনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। নগরায়নের হার ১৯৭২ সালের কম-বেশী ১৫% এ স্থলে বর্তমানে প্রায় ৪০% এ গিয়ে ঠেকেছে। সড়কের দৈর্ঘ্য স্বাধীনতা পরবর্তী ৮-১০ হাজার কিলোমিটারের স্থলে বর্তমানে প্রায় ৩.৫০ লক্ষ কিলোমিটারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে সারা বছর নাব্য পানিপথের দৈর্ঘ্য ২৪ হাজার কিলোমিটার থেকে হ্রাস পেয়ে এখন মাত্র ৩.৫০ হাজার কিলোমিটারে গিয়ে ঠেকেছে। রেলের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এর দৈর্ঘ্য ১৯৭২ এর তুলনায় হ্রাস পেয়েছিল। ১৯৯৬-২০০১, ২০০৯-২০১৪ এবং বর্তমানের মহাজোট সরকারের আমলে তা সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে যা কাংখিত অবস্থা থেকে অনেক অনেক নীচে আছে। অপর দিকে মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনে কৃষির অংশ ১৯৭২ সালের প্রায় ৪৯.০% থেকে হ্রাস পেয়ে বর্তমানে ২০.০% এ গিয়ে ঠেকেছে (মৎস উপখাতসহ)। কৃষির অবদান কমলেও শিল্পের অবদান কিন্তু সে তুলনায় বৃদ্ধি পায় নি। ১৯৭২ এর ১২.০% এর স্থলে শিল্পের অবদান বর্তমানে মাত্র ২০.০%এর মত (১,২,৩)। তার মানে বৃদ্ধি পেয়েছে আসলে সেবা খাতসমূহের অবদান। ট্যাক্স-জিডিপি রেশিও সবে সিঙ্গেল ডিজিট অতিক্রম করেছে (২০১৩, ১১.০% এর মত)। অথচ ভারতে এটা ১৮.০% এর মত, এমনকি পাকিস্তানেও তা ১৪.০%এর মত। শিক্ষার ক্ষেত্রেও আমরা পার্শ্ববর্তী অনেক দেশের তুলনায় পিছিয়ে গেছি সরকারগুলোর বিশেষ করে পঁচাত্তর পরবর্তী সামরিক সরকারগুলোর ভুল নীতির কারণে। ১৯৭৪-এর কুদরত-ই-খোদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়িত হলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হতো না। বরং আমরা অন্যদের তুলনায় থাকতাম অগ্রগামী। পঁচাত্তর পরবর্তী সময়ে নব্য উদারবাদিতার নামে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ আমাদের সামরিক শাসকদের দিয়ে এদেশে বাজার অর্থনীতি চালুর ব্যবস্থা করে যা বিগত শতাব্দির আশি ও নব্বইয়ের দশকে কখনো কাঠামোগত সংস্কার, কখনো বাজার উদারীকরণ ও বিরাষ্ট্রীয়করণের নামে আমাদের দেশীয় গোটা অর্থনীতিকে তস্‌নস্‌ করে দেয়। ঢালাও বেসরকারীকরণ ও তথাকথিত বেসরকারী খাতের বিকাশের নামে জিয়া ও এরশাদের সামরিক শাসনামলে ও বেগম জিয়ার তথাকথিত গণতান্ত্রিক আমলে দেশে মূলত: ব্যাপক লুণ্ঠন যজ্ঞ চলেছে। লুণ্ঠনের ক্ষেত্র ছিল মূলত: সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ: বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন; বাংলাদেশ বিমান, বাংলাদেশ রেলওয়ে; বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্পোরেশন, সরকারী ব্যাংকসমূহ, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন, বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন, বাংলাদেশ মৎস উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ শিপিং ও ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন, বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিল্‌স কর্পোরেশন ইত্যাদি। এ লুণ্ঠন প্রক্রিয়ায় এদেশে বিদেশী সাহায্যেরও প্রায় ৭৫.০% এরা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় আত্মসাৎ করেছে। পাকিস্তান আমলের ২২ পরিবারের স্থলে ২২ হাজার ধনী পরিবারের সৃষ্টি হয়েছে। লক্ষ গুন বৃদ্ধি পেয়েছে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য। অথচ আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের আকাংখা ছিল একটি সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। আর সেজন্যে গোটা পাকি আমলের বৈষম্য-নিপিড়ন বিরোধী আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহেকে ধারণ করে ১৯৭২ সালের সংবিধানে রাষ্ট্রের ৪টি মূলনীতি বা লক্ষ্য বিধিবদ্ধ করা হয় : বাঙালী জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র। বাঙালী জাতীয়তাবাদ এর মানেই হচ্ছে : বাংলা আমাদের ভাষা, বাঙালীয়ানা আমাদের সংস্কৃতি, বাঙালী আমাদের পরিচয়; মোট কথা ভাষা, আচার-আচারণ, জীবণপ্রণালী ইত্যাদি সবকিছুতে আমাদের মিল আছে যা যুগে যুগে বহি:শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রামে আমাদেরকে একতাবদ্ধ করেছে। বৃটিশ ঐপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে আমাদেরকে একতাবদ্ধ করেছিল। পাকি নব্য-উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনে আমাদেরকে প্রেরণা যুগিয়েছিল। বাঙালী জাতীয়তাবাদ অতীতে আমাদেরকে যেমন একতাবদ্ধ রেখেছে, বর্তমানেও তেমনি রেখে চলেছে এবং ভবিষ্যতেও রাখবে। আর সেকারণেই রাষ্ট্র পরিচালনার এটা হচ্ছে প্রথম মৌল নীতি। ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার। অর্থাৎ সকল ধর্মাবলম্বী মানুষ তাদের স্ব স্ব ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করবে। এক ধর্মাবলম্বী মানুষ অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষকে তার ধর্ম পালনে কোনও রকম বাধা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। রাষ্ট্র ধর্মের ব্যাপারে নাক গলাবে না, বরং ধর্ম পালনে সকলের জন্যে শান্তি পূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে সহযোগিতা করবে। সেজন্যেই আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনায় দ্বিতীয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতি হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষতা। আমাদের দেশের তথা জাতীয় সকল আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা অর্থাৎ জনগণ দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দ রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরের শাসনকার্য পরিচালনা করবে। অতএব, গণতন্ত্র হচ্ছে আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার তৃতীয় এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য বা নীতি। আমাদের ৪র্থ এবং সর্বশেষ লক্ষ্য বা নীতি হচ্ছে সমাজতন্ত্র। অন্যভাবে বললে আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে শোষণমুক্ত এক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যেখানে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের /সদস্যের ৬টি মৌলিক অধিকার খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। মনে রাখতে হবে যে, আমাদের সকল আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে বৈষম্য-শোষণ-বঞ্চনাহীন এক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। সেরকম এক সমাজব্যবস্থার নিশ্চয়তা একমাত্র সমাজতন্ত্রই দিতে পারে। আর তা প্রতিষ্ঠিত হবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরাই সমাজতন্ত্র বা সমতাধর্মী এক সমাজ প্রতিষ্ঠার

সিদ্ধান্ত নেবেন সংসদে আইন পাশের মাধ্যমে। বলা হচ্ছে ১৯৭২ এর সংবিধান পুন:স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনায় আমরা এর তেমন প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের দেশে এ যাবৎ ৬টি পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা, ২টি পিআরএসপি, ১টি দ্বিবার্ষিক ও ১টি বার্ষিক পরিকল্পনা রচিত ও বাস্তবায়িত হয়েছে বা হচ্ছে। এর মধ্যে একমাত্র জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আমলে রচিত প্রথম পঞ্চ বর্ষিক পরিকল্পনা রচনার ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে উপরোল্লেখিত জাতীয় চার মূল লক্ষ্য বা নীতিকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছিল। অত্যন্ত দু:খের বিষয় যে, বঙ্গবন্ধু এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে যেতে পারেন নি। বাস্তবায়নের মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় ১৯৭৫ এর ১৫-ই আগষ্ট বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের ইন্ধনে ও সহযোগিতায় ১৯৭১-এর পরাজিত শক্তি তাঁকে স্বপরিবারে অত্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যা করে। অত:পর সাম্রাজ্যবাদীচক্রের পরামর্শে সামরিক শাসক জিয়া এদেশে সংবিধানের চার লক্ষ্যকে ভূলুণ্ঠিত করে পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতির নামে প্রবৃদ্ধি তত্ত্ব বাস্তবায়ন শুরু করে। আর এক সামরিক শাসক এরশাদ একে চরমে পৌছে দেয়। একথা সকলেরই জানা যে, প্রবৃদ্ধি তত্ত্বের মূল কথা হচ্ছে প্রবৃদ্ধি হলে তার ফসল চুঁইয়ে গিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটাবে। বাস্তবে কি তা হয়? মোটেও না। আমাদের সবারই হয়ত: মনে আছে যে, ১৯৯০ এ যখন সামরিক শাসক এরশাদের পতন হয় তখন দেশের অর্ধেকেরও বেশী মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে চলে গিয়েছিল। ভূমিহীনতা সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ করেছিল। উন্নয়ন বাজেটের বিদেশী সাহায্য নির্ভরতা ৯৮.০% উঠেছিল। আমদানী নির্ভরতা সর্বকালের রেকর্ড ভেঙ্গেছিল। সকল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল। নির্বাচনের নামে যা করা হয়েছিল তা বাহাস ও প্রহসন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সরকারী খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহকে একেবারে পঙ্গু করে দেয়া হয়েছিল। পরিকল্পনার নামে যা করেছিল দুই সামরিক শাসক তাকে বাহাস বললে খুব কমই বলা হবে। কারণ ঐ সময়ের পরিকল্পনা আসলে গণবিরোধী তথা সংবিধান বিরোধী ছিল। আর ১৯৯১ এর তথাকথিত গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে খালেদা জিয়া ক্ষমতায় এসে আরও এক ডিগ্রী এগিয়ে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফের পরামর্শে পরিকল্পনাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেন। ঘূর্ণায়মান পরিকল্পনা, বাজেট সংস্কার, মন্ত্রণালয়ভিত্তিক বাজেট ইত্যাদি নানা পরীক্ষা-নিরিক্ষার ফলশ্রুতিতে দেশে উৎপাদনহীনতাসহ এক মহাদুর্যোগপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হয়। ১৯৯৬ এ শেখ হাসিনা এসে আবার পরিকল্পনা ফিরিয়ে আনেন। তবে তা পুরোপুরি সংবিধানের লক্ষ্যের আলোকে রচিত হয় নি। তবুও সরকারী খাতকে কিছুটা চাঙ্গা করাসহ বন্টন-পুনর্বন্টনমূলক বেশ কিছু কর্মসূচী গ্রহণ করায় সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় কিছুটা উন্নতি আসে এবং দেশ ২০০০ সাল নাগাদ খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। ২০০১ এ খালেদা জিয়া ক্ষমতায় এসে পুনরায় সাম্রাজ্যবাদীদের পরামর্শে আবার পরিকল্পনা বাদ দিয়ে পিআরএসপি করে যা বিশ্ব ব্যাংকের বোর্ড সভায় ওয়াশিংটনে পাশ হয় এবং খালেদা জিয়ার সরকার বাস্তবায়ন করে। ১ম পিআরএসপি ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও ২য় পিআরএসপি চাপিয়ে দেয়া হয় আমাদের উপর (১৮)। ২০০৬ সাল নাগাদ আবার দেশ এক মহাসংকটে পড়ে। খালেদা সরকারের নির্মম পতন দেখে দেশবাসী। আসে মইনউদ্দিন-ফখরুদ্দিনের অনির্ধারিত তথাকথিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার। ২০০৮ এ ক্ষমতায় এসে শেখ হাসিনার সরকার পুনরায় পরিকল্পনায় যায়। রচিত হয় ৬ষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা যার মেয়াদ শেষ হবে ২০১৫ সালে। দেশ আবার খাদ্যসহ অনেক কিছুতেই স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পথে অথবা অর্জন করেছে। বর্তমান সরকার ইতোমধ্যেই সপ্তম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা রচনার কাজে হাত দিয়েছে। ২০০০ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ লক্ষ্যের ৮টির মধ্যে বেশীর ভাগই আমাদের দেশ ইতোমধ্যেই অর্জন করে ফেলেছে অথবা অর্জন করার কাছাকাছি রয়েছে। আশা করা যায় ২০১৫ সাল নাগাদ (মেয়াদ: ১৯৯০-২০১৫, ২৫ বছর) সবগুলোই অর্জিত হবে। আমাদের ইতিহাসের কালো অধ্যায়গুলো যদি না আসতো, তা'হলে আমরা বহু পূর্বেই উন্নত দেশে পরিণত হতে পারতাম; অন্য কথায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হতাম। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, উন্নয়ন হয়েছে আমাদের দেশে, যদিও কাংখিত এবং টেক্সই উন্নয়ন বলতে যা বোঝায় তা হয় নি। আলোচ্য প্রবন্ধে তাই আমরা আমাদের অর্থনীতির মূলখাতগুলোভিত্তিক টেক্সই ও কাংখিত উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনা করবো।

ভূমির ব্যবহার

অর্থনীতি শাস্ত্রে ভূমিকে অভিহিত করা হয়েছে উৎপাদনের আদি ও অবিনশ্বর উপাদান হিসেবে। ব-দ্বীপ তথা প্লাবন সমভূমির দেশ আমাদের এই মাতৃভূমি বাংলাদেশ। অত্যন্ত উর্বর এর ভূ-পৃষ্ঠ। অথচ উন্নয়নের নামে এর যথেচ্ছ ব্যবহার করা হয়েছে। বসতি নির্মাণ, নগরায়ণ, অবকাঠামো নির্মাণ ইত্যাদি প্রায় প্রত্যেকটি কাজেই জমির অপব্যবহার তথা অপচয় করা হয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও সরকার প্রতিযোগিতায় নেমেছে মনে হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে আমাদের দেশের আবাদী জমি আশংকাজনক হারে হ্রাস পাচ্ছে। ১৯৭২ সালে আমাদের দেশে আবাদী জমির পরিমান ছিল প্রায় সাড়ে আট মিলিয়ন হেক্টর। আমার বিশ্বাস বিগত ৪৩ বছরে তা কম-বেশী দু'মিলিয়ন হেক্টর হ্রাস পেয়ে বর্তমানে কম-বেশী সাড়ে ছয় মিলিয়ন হেক্টরে এসে দাঁড়িয়েছে। এক হিসেবে দেখা গেছে যে, আমাদের দেশে প্রতিদিন প্রায় ৩২০

হেক্টর কৃষি জমি চলে যাচ্ছে উপরে বর্ণিত অ-কৃষি কর্মকান্ডে। তার মানে বছরে ০.১১৭ মিলিয়ন হেক্টর জমি বিলিন হয়ে যাচ্ছে যা বছরে প্রায় ১.৫ মিলিয়ন মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা ধ্বংস করে দিচ্ছে (১২)। অন্যভাবে বলা যায় যে, প্রতি বছর আমাদের দেশের প্রায় ১.০% আবাদী জমি বিলিন হয়ে যাচ্ছে যা আমরা চাইলেও আর কখনো কৃষি কাজে ফিরিয়ে আনতে পারবো না। এ ভাবে চলতে থাকলে ২০৭১ সালের পর কৃষি কাজের জন্যে আমাদের দেশে আর কোনও জমি অবশিষ্ট থাকবে না। আমরা কেহই এমনটা দেখতে চাই না। কিন্তু বর্তমানের প্রবণতা থেকে এটা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, দ্রুতই আমরা একটা কৃষ্ণ গহ্বরের দিকে ধাবিত হচ্ছি। এ মহাধ্বংসাত্মক প্রবণতা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র একটি পরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার নীতিমালা। এটা সময়ের দাবী। এতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে :

১। ভূমির আনুভূমিক ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে এবং উল্লম্ব ব্যবহার উৎসাহিত করতে হবে ।

২। শিল্পায়নের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বা অনুর্বর জমিকে প্রাধান্য দিতে হবে। কোনও অবস্থাতেই উর্বর বা উৎকৃষ্ট ভূমি এ কাজে বরাদ্দ দেয়া চলবে না। এ ক্ষেত্রে আধুনিক পরিবহন অবকাঠামো গড়ে তোলার মাধ্যমে শিল্পায়নের কাজে প্রত্যন্ত এলাকার অপেক্ষাকৃত অনুর্বর তথা নিকৃষ্ট জমি ব্যবহারকে উৎসাহিত করতে হবে।

৩। জমির উর্বরতা বৃদ্ধির স্বার্থে জৈব জ্বালানীর ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে। আর এ জন্যে সারা দেশব্যাপী সিলিন্ডারজাত গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। জরুরী ভিত্তিতে সমুদ্র উপকূলে গ্যাস টার্মিনাল স্থাপন করে বিদেশ থেকে (কাতার, মিয়ানমার, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়ার মত দেশগুলোতে গ্যাসের বিশাল মজুদ রয়েছে) ট্যাংকারের সাহায্যে গ্যাস আমদানী করে তা সিলিন্ডারজাত করে সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব বলে আমরা মনে করি। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সাথে আমাদেরকে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তিতে যেতে হবে।

৪। নদ-নদী ও সাগর থেকে জমি উদ্ধার করতে হবে। আমাদের দেশের দক্ষিণ সীমান্ত সাগরের দিকে উন্মুক্ত। ২৪ হাজার কিলোমিটার নদী রয়েছে আমাদের। অনেক স্থানেই এগুলো প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রশস্ত। খনন-পুন:খননের মাধ্যমে এগুলোর গভীরতা বাড়িয়ে ও প্রশস্ততা হ্রাস করে প্রচুর পরিমাণ জমি উদ্ধার করা সম্ভব বলে আমরা মনে করি। চীনসহ মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার অনেক দেশ মরুভূমি থেকে যদি জমি উদ্ধার করতে পারে তা'হলে আমরা কেন নদী ও সাগর থেকে তা পারবো না। টেক্সই উন্নয়ন ও ভবিষ্যত প্রজন্মের কথা মনে রেখে অবশ্যই আমাদেরকে এ বিষয়ে ভাবতে হবে।

৫। বাসস্থানসহ শিল্প-কারখানা, অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি যেকোন ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে বহুতল (কমপক্ষে ১০ তলা ভিতসহ) বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ বাধ্যতামূলক করতে হবে। এতে করে বিপুল পরিমাণ জমি বাঁচানো সম্ভব হবে। পল্লী এলাকায়ও চীনাদের মত আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ বহুতল (কমপক্ষে ১০ তলা) ভবন নির্মাণ করে জমি উদ্ধার প্রক্রিয়া শুরু করা ইতোমধ্যেই জরুরী হয়ে পড়েছে বলে আমরা মনে করি (২৫, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩)।

৬। সড়ক নির্মাণ বন্ধ করতে হবে। আমাদের দেশে বর্তমানে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ কিলোমিটার বিভিন্ন ধরনের সড়কপথ রয়েছে যার বেশীর ভাগই প্রায় ব্যবহার অনুপোযোগী। দু:খজনক হলেও একথা সত্য যে, পঁচাত্তর পরবর্তী সামরিক শাসনামলে বিশেষ করে আশির দশকে রেলকে অবহেলা করে সড়ক নির্মাণে বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ১৯৭০ সাল নাগাদ দেশে প্রায় তিন লক্ষ কিলোমিটার সড়ক পথ নির্মাণ করা হয়। এতে কম করে হলেও প্রায় এক মিলিয়ন হেক্টর উর্বর তথা উৎকৃষ্ট ফসলী জমি ধ্বংস করা হয়েছে। অথচ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত যদি রেলপথ নির্মাণের উপর গুরুত্ব দেয়া হতো তা'হলে এ অপূরণীয় ক্ষতি থেকে আমাদের দেশ রক্ষা পেত। এ জমি আর কোনও দিন আমরা ফেরত পাবো না। এত রাস্তা নির্মাণ না করে আমরা যদি মাত্র ১০ হাজার কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণ করতাম তা'হলে সড়ক পথের চেয়ে লক্ষ গুন বেশী উপকৃত হত দেশ ও দেশের জনগণ এবং এত বিপুল পরিমাণ জমিও হারাতে হতো না (১৪,১৫,২০)। বর্তমান মাহজোট সরকার রেলপথের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এটা শুভ লক্ষণ। তবে অত্যন্ত সম্ভূক গতিতে চলছে কাজ। এতে আমরা হতাশ। আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান এক জাতি। কথাটা এজন্যে বলছি যে, আমাদের প্রিয় রাজধানী ঢাকা বাংলাদেশের একেবারে মাঝখানে অবস্থিত। টেকনাফ থেকে ঢাকার যে দূরত্ব, ঠিক একই দূরত্ব তেতুলিয়া থেকে । অন্য দিকে সাতক্ষীরা ও তমাবিল থেকেও ঠিক একই অবস্থা বিরাজমান। রাঙ্গামাটি-সাপাহার এবং কলাপাড়া-হালুয়াঘাটের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। দীর্ঘ মেয়াদে আমাদের দেশের সীমান্তবর্তী উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোসহ স্থল ও নৌ বন্দরগুলোকে আধুনিক রেলপথ নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। মাল্টি ট্রাকবিশিষ্ট রেলপথ নির্মাণ করতে হবে যাতে পথে ক্রসিংএ সময় নষ্ট না হয়। সকল ধরণের ক্রসিং এ ওভারপাস নির্মাণ বাধ্যতামূলক করতে হবে। রেলপথকে বিদ্যুতায়িত করতে হবে। প্রয়োজনে নিজস্ব বিদ্যুত কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে যাতে

বিদ্যুত সরবরাহ বাধাগ্রস্থ না হয়। রেলের সাথে নৌ পরিবহণকে তথা পথকে সমন্বিত করে গড়ে তুলতে হবে। আধুনিক ও দক্ষ অর্থনীতি গড়ে তুলতে হলে এর কোনও বিকল্প আছে বলে আমি মনে করি না। ভারতীয়রা নিজেরাই প্রতিবছর গড়ে ৬০০ কিলোমিটার করে রেলপথ বানাচ্ছে। তারপরও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চীনকে আরও রেলপথ নির্মাণে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছেন। চীন এতে সম্মত হয়েছে (৩০,৩১,৩২,৩৩)। আমাদের সরকারও চীনকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করতে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাতে পারে। চীন এতে রাজী হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। কারণ ব্যবসা-বাণিজ্যসহ যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্যে দক্ষিণ এশীয় করিডোর নির্মাণে চীন ইতোমধ্যেই তৎপর রয়েছে বলেই আমরা জানি। অতএব, এক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের স্লোগান হবে : জমি বাঁচান, দক্ষ ও সুবিস্তৃত রেল ও নৌপথ গড়ে তুলুন, দক্ষ অর্থনীতি গড়ে তুলুন !

কৃষি উন্নয়ন

কৃষি বর্তমানে আমাদের দেশের মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের মাত্র ২০.০% দিচ্ছে (মৎস্যসহ)। অথচ এখাতের সঙ্গে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে প্রায় ৬০.০% মানুষ। বিশ্বে যত ধরণের প্রযুক্তি আছে তার প্রায় সবই আমাদের কৃষিতে এসে গেছে এবং ব্যবহৃত হচ্ছে। এর সাথে রয়েছে দেশীয় বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত বিভিন্ন ধরণের বীজ, যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতি। কিন্তু সকল কৃষক কি তা সমানভাবে ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে? পাচ্ছে না। তার কারণ মালিকানার বৈষম্য। আমাদের কৃষিতে এ বৈষম্য বর্তমানে প্রকট রূপ ধারণ করেছে। দেশের প্রায় ৭০.০% কৃষক হচ্ছে প্রান্তিক কৃষক যাদের ভূমির পরিমাণ অর্থনৈতিক জ্যোতের আকারের অনেক নীচে। তারা মূলত: বরগা বা ভাগ চাষী। বাকী ৩০.০% এর মালিকানাধীন ভূমির পরিমাণ মোটামুটিভাবে অর্থনৈতিক জ্যোতের কাছাকাছি। তবে কোন ক্রমেই তা উন্নত দেশের মত নয়। আমরা সবাই জানি যে, আমাদের কৃষিতে একটি অত্যন্ত শক্ত মধ্যস্বত্ত্বভোগী শ্রেণী বিদ্যমান আছে। বিভিন্ন কৃষি উপকরণ ও উৎপাদিত ফসলের বাজার মূলত: এরাই নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে আমাদের প্রান্তিক কৃষকরা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করেও লাভবান হতে পারছে না।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং কৃষকের তথা প্রান্তিক কৃষকের সহায়তার জন্যে স্বাধীনতার পরপরই ১৯৭২ সালে পূর্ব পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনকে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন নামে পুনর্গঠন করেছিলেন। এর মাধ্যমে আমাদের দেশের কৃষকদেরকে ন্যায্য মূল্যে অথবা বিনা মূল্যে সেচযন্ত্রসহ বিভিন্ন কৃষি উপকরণ সরবরাহ শুরু করেছিলেন। কৃষক ভাইদের জন্যে তিনি ভর্তুকীরও ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু পঁচাত্তর পরবর্তী সরকারগুলো বিশেষ করে জিয়া, এরশাদ ও খালেদা জিয়ার সরকার সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ এর পরামর্শে সকল ধরণের ভর্তুকী তুলে দেয়। বিএডিসিকে তস্‌নস্‌ করে দেয়। এর মালিকানাধীন সমস্ত সেচযন্ত্র ও যন্ত্রাংশ পানির দামে ব্যক্তি মালিকদের কাছে বিক্রি করে দেয়। বীজ উৎপাদনসহ এর সমস্ত সম্প্রসারণমূলক কর্মকান্ড বন্ধ করে দেয়। এভাবে এ সংস্থাটিকে একেবারে পঙ্গু করে দেয়। এমন কি বঙ্গবন্ধুর আমলে দেয়া দাম সহায়তাও তুলে দেয়া হয়। ফলশ্রুতিতে আমাদের কৃষি মুখ থুবরে পড়ে। দেশ ক্রণিক খাদ্য ঘাটতির ফাঁদে আটকে যায়। ১৯৯৬ এ শেখ হাসিনার সরকার এসে সাম্রাজ্যাবাদীদের আপত্তি সত্ত্বেও বিএডিসিকে আবার চাঙ্গা করে এবং কৃষিতে কৃষককে দেয়া যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ও ভর্তুকী ব্যবস্থা পুনরায় চালু করে। আমাদের বীর কৃষক ভাইয়েরা এর প্রতিদান দিয়েছিল। দেশ ২০০০ সাল নাগাদ খাদ্য শষ্য উৎপাদনে শুধু স্বয়ংসম্পূর্ণতাই অর্জন করেনি, উদ্বৃত্ত্ব উৎপাদন করতে সমর্থ হয়েছিল। ২০০১ সনের নির্বাচনে খালেদা জিয়া যখন ক্ষমতাসীন হন তখন দেশে ২২ লক্ষ টন খাদ্য শষ্য উদ্বৃত্ত্ব ছিল। ক্ষমতায় এসেই তিনি পুনরায় সাম্রাজ্যবাদীদের পরামর্শে বাজার অর্থনীতির নামে পূর্বের খেলায় মেতে ওঠেন। পুনরায় বিপর্যয় নেমে আসে কৃষিতে। ২০০৬ সনে খালেদা জিয়ার নির্মম পতনের সময়ে দেশে বিশাল (প্রায় ২০ লক্ষ টন) খাদ্য ঘাটতি রেখে যান তিনি। ২০০৮ এ শেখ হাসিনার মহাজোট সরকার ক্ষমতায় এসে আবার বিএডিসিকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ভর্তুকীসহ কৃষককে প্রদত্ত সকল সুযোগ সুবিধা পুন: চালু করেন। ১০ টাকায় ব্যাংকে হিসেব খোলা, স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান, ঋণের পরিমান বৃদ্ধি ইত্যাদি আরও অনেক নতুন সুবিধাদি কৃষককে দেয়া হয়। ফলে দেশ আবার খাদ্য শষ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে।

এত কিছুর পরেও বাজার অর্থনীতির কারণে আমাদের প্রান্তিক কৃষক মার খাচ্ছে। ন্যায্য দাম পাচ্ছে না। লাভবান হতে পারছে না। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্যে কৃষির সমবায়ীকরণের কোনও বিকল্প নেই। এ ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর বাকশাল কর্মসূচীর আওতায় কৃষির পরীক্ষামূলক সমবায়ীকরণ নীতি আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে। তিনি পরীক্ষামূলকভাবে আমাদের দেশের ১২৫টি তৎকালীন থানায় বহুমুখী সমবায় গঠন করার কর্মসূচী হাতে নিয়েছিলেন। ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় রেখে যৌথ চাষাবাদের মাধ্যমে দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধি করাই ছিল

এর মূল লক্ষ্য। চাষীরা যাতে ভুল না বোঝে, সেজন্যে ১৯৭৫ এর ২৬ শে মার্চ ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বিশাল এক কৃষক সমাবেশ করেছিলেন। অত্যন্ত দু:খের বিষয় যে, এটাই ছিল তার সর্বশেষ জনসভা। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি সম্মানের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। আমি কয়েক বন্ধুসহ তাঁর নীতি নির্ধারণী ভাষন শোনার জন্যে একেবারে সামনের সারিতে বসেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, "কৃষক ভাইয়েরা আমার, আমি আপনাদের জমি নেবো না। জমির মালিক আপনারাই থাকবেন। শুধু চাষাবাদের কাজটা যৌথভাবে হবে। আমরা সরকারের পক্ষ থেকে ন্যায্য মূল্যে সেচ সুবিধাসহ যাবতীয় কৃষি উপকরণ সরবরাহ করবো এবং আপনাদের কাছে পৌছে দেবো। উৎপাদিত ফসল জমির মালিকানা, শ্রম ও উপকরন সরবরাহকারীবৃন্দের মধ্যে সমান ভাগ হবে। উৎপাদন বৃদ্ধিই এর মূল লক্ষ্য"।

বর্তমান বিশ্বে প্রায় সব উন্নত দেশেই সমবায় আছে - হোক তা পুঁজিবাদী বা সমাজতন্ত্রী। কর্মকান্ডের ধরনে কিছু প্রার্থক্য থাকলেও মূল লক্ষ্য এদের এক। আর তা হচ্ছে উৎপাদন বৃদ্ধি ও টেক্সই উৎপাদন। এখানেই বঙ্গবন্ধুর সমবায় চিন্তা বর্তমান বাংলাদেশ কৃষির টেক্সই উন্নয়নের জন্যে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের প্রান্তিক কৃষককে মধ্যসত্ত্বভোগীদের কবল থেকে রক্ষার জন্যে এবং টেক্সই কৃষি উন্নয়নের জন্যে যত দ্রুত সম্ভব কৃষির সমবায়ীকরণ করতে হবে। তিন ধরণের সমবায় গড়ে তুলতে হবে : (ক) উৎপাদন সমবায়; (খ) সরবরাহ সমবায় এবং (গ) বিপনন সমবায়। আমূল ভূমি সংস্কার প্রবর্তন করে মালিকানা ব্যবস্থায় ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সমস্ত খাস জমি, জলাশয়, নদ-নদী এমনকি সাগর উৎপাদন সমবায়ের কাছে হস্তান্তর করতে হবে। বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী। আমরা যত দ্রুত এটা অনুধাবন করতে সক্ষম হবো ততই তা দেশের জনগণের জন্যে মঙ্গল বয়ে আনবে।

শিল্পোন্নয়ন

শিল্পোন্নয়নেই আমাদের দেশের ভবিষ্যত। বর্তমানে এ খাত থেকে মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের মাত্র ২০.০% আসছে। ২০১০ সালের শিল্পনীতিতে তাই এ খাতের অবদান ২০২১ সাল নাগাদ ৪০.০% এ উন্নীত করার আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে। তবে এটা শুধুমাত্র বেসরকারী খাতের উপর ভরসা করে অর্জন করা সম্ভব নয়। সরকারী খাতকেও এ প্রক্রিয়ায় শক্তভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে। অবশ্য শিল্পনীতিতে সরকারী খাতের উপরও সম গুরুত্ব আরোপের কথা বলা হয়েছে। বাস্তবে কিন্তু তার প্রতিফলন খুব একটা দেখা যাচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রী বেসরকারীকরণ বন্ধ করেছেন বটে, কিন্তু সরকারী খাতের বন্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ লাভজনকভাবে চালানোর জন্যে তেমন কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছেন না। আমরা মনে করি যে, চীনের আদলে সরকারী খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের সমস্যা সঠিকভাবে চিহ্নিত করে তার দ্রুত সমাধান করতে হবে। আধুনিকায়ন করতে হবে : যেখানে প্রয়োজন আরও বেশী উৎপাদনশীল যন্ত্রপাতি বসাতে হবে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অব্যবহৃত জমি, পুকুর ইত্যাদির অর্থনৈতিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। পণ্যের গুনগত মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি নিয়োগ দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই যে- কোন ধরণের হস্তক্ষেপ চিরতরে বন্ধ করতে হবে। সরকারী খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোকে বেসরকারী খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে দস্তুরমত প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে হবে। চীনারা এভাবেই তাদের দেশের সরকারী খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করতে সমর্থ হয়েছে। তারা পারলে আমরা কেন পারবো না।

বেসরকারী খাতের ক্ষেত্রেও স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। প্রণোদনা ও শুল্ক রেয়াতের নামে অনির্দিষ্টকালের জন্যে তাদেরকে ভর্তুকী বা খয়রাতি সাহায্য দেয়া যাবে না। এগুলো বাদেই তাদেরকে দক্ষতার প্রমাণ দিতে হবে। মূল্য স্ফীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির একটা স্থায়ী ব্যবস্থা এ খাতে থাকতে হবে। আর এটা নিশ্চিত করা না গেলে এ খাতের অস্থিরতা কখনও দূর হবে না।

বঙ্গবন্ধুর আমলে আমদানী বিকল্প শিল্পনীতি করা হয়েছিল। কিন্তু পঁচাত্তর পরবর্তী সরকারগুলো অন্যান্য অনেক কিছুর মত এটাকে নির্বাসনে পাঠায় যা আমাদের শিল্পোন্নয়নের পথকে বন্ধ করে দিয়েছিল বলা যায়। সাম্রাজ্যবাদীদের পরামর্শে আমদানী বিকল্প নীতি বাদ দিয়ে তারা রপ্তানী ত্বাড়িত শিল্পনীতি অনুসরণ করে। ফলশ্রুতিতে আমাদের দেশ আমদানী নির্ভর দেশে পরিণত হয়। রপ্তানী মূলত: তৈরী পোষাক নির্ভর ছিল যার প্রায় সবকিছুই (মেশিনপত্র, জিপার, বোতাম, সূতা, কাপড় এমন কি অভিজ্ঞ ও দক্ষ জনশক্তি) আমদানী করতে হতো। তার মানে এ ক্ষেত্রে খুব সামান্যই মূল্য সংযোজন হতো (২০.০%এর মত)। পোষাক শিল্পের জন্যে প্রয়োজনীয় মেশিনপত্র ও কাঁচামাল আমদানীর বিল পরিশোধে এর রপ্তানী আয়ের প্রায় ৮০.০% ব্যয় হয়ে যেত (২৮)। ১৯৭৮ সালে পোষাক শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। অথচ ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত এর ব্যাকওয়ার্ড ও ফরোওয়ার্ড লিংকেজ নিয়ে কোন চিন্তাই করেনি এ সময়ের সরকারগুলো। নেয়া হয়নি প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার কোনও পদক্ষেপ। অতিমাত্রায় বেসরকারী খাত নির্ভরতার ফলে তথাকথিত পোষাক

কারখানার নামে মালিকরা বিনা শুল্কে প্রয়োজনাতিরিক্ত কাপড় আমদানী করে কালো বাজারী করেছে যা দেশের উঠতি কাপড় শিল্পকে পথে বসিয়েছে। এর বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করেছে যার রেশ আমাদেরকে এখনও টানতে হচ্ছে - ঘাটতি মেটাতে কাপড় আমদানী করতে হচ্ছে। ১৯৯৬ সনে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে এ ব্যাপারে কিছু পদক্ষেপ নেয় যার ফলশ্রুতিতে আমাদের দেশে বেশ কিছু প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট গড়ে ওঠে। এ সরকারই অর্থনৈতিক কুটনীতি চালু করে। ২০০৯-১৪ সময়ে তো পুরোদস্তুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেন শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার। এ পদক্ষেপগুলোর ফলে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও এখনও অনেক কিছু করতে হবে। এখানেই বঙ্গবন্ধুর আমদানী বিকল্প নীতি আমাদের জন্যে প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়ায়, পথ দেখায়। পোষাক শিল্পের যন্ত্রপাতি ও মেশিনপত্রসহ সকল ধরণের ভারী মৌলিক শিল্পজাত পণ্য আমরা এখনও প্রায় পুরোটাই আমদানী করছি। এমন কি কম্পিউটারসহ যাবতীয় আইসিটি ও মোবাইল প্রযুক্তিজাত পণ্যও আমরা আমদানী করে চলেছি। অথচ চীনারা এগুলো রপ্তানী করছে দেশের চাহিদা মিটিয়ে। সারা বিশ্বের বাজারে তারা ভারী যন্ত্রপাতি-মেশিনপত্রসহ যাবতীয় আইসিটি ও মোবাইল প্রযুক্তিজাত পণ্য রপ্তানী করছে। সর্বশেষ তারা তাদের দেশে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির "এয়ার বাস" প্রস্তুতের কারখানা গড়ে তুলেছে। চীনা সরকার তার ক্রমবর্ধমান বিমান কোম্পানীগুলোর জন্যে এ কারখানায় প্রস্তুতকৃত ২৮০ টি বিমান ক্রয়ের কার্যাদেশ দিয়েছে। ইতোমধ্যেই কারাখানাটি বিমান সরবরাহ শুরু করেছে। চীন ২০১৪ সালে মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রকে পেছনে ফেলে এক নম্বর অর্থনীতির দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বর্তমানে মার্কিন অর্থনীতির আয়তন ১৭.৪ ট্রিলিয়ন ডলার, আর চীনের ১৭.৬ ট্রিলিয়ন ডলার (জিডিপি, পিপিপি হিসেবে) (৩০,৩১,৩২,৩৩)। এ ব্যবধান আরও বাড়বে। কারণ চীনের প্রবৃদ্ধি এখনও ৭.০% এর উপরে, আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় শূণ্য।

আমি মনে করি যে, ২০১০ সালের শিল্পনীতিকে যুগোপযোগী করে নতুন শিল্পনীতি রচনা ও বাস্তবায়ন করতে হবে। এ নীতিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে :

১। সরকারী ও বেসরকারী খাতকে অবশ্যই সমান গুরুত্ব দিতে হবে। পঁচাত্তর পরবর্তী সময়ে তৎকালীন সরকারগুলোর ঢালাও বাজার অর্থনীতি তথা বেসরকারী খাতের বিকাশের অবাধ নীতির সুযোগে আমাদের দেশের তথাকথিত পুঁজিপতিরা সরকারী খাতের প্রতিষ্ঠাণসমূহে নির্বিচার এক লুন্ঠন যজ্ঞ চালায় : সরকারী ব্যাংকসমূহ থেকে ঋণ নিয়ে ফেরত দেয়নি, উৎপাদনমুখী খাতে বিনিয়োগও তেমন একটা করেনি। সরকারী ব্যাংকের ঋন নিয়ে সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কিনে নিয়েছে পানির দামে। সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কিনে নিয়ে তারা সেগুলো লাভজনকভাবে চালানোর কোনও উদ্যোগ তো নেয়ই নি; বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলোর জমি, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি স্থায়ী সম্পদ উচ্চ দামে বিক্রি করে দিয়ে নিজেদের আখের গুছিয়েছে। ১৯৯৬-২০০১ সময়ে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার এবং ২০০৯-১৪ সময়ে বর্তমান মহাজোট সরকার বেসরকারী খাতের তথাকথিত উদ্যোক্তাদের এহেন আচরণে বিরক্ত হয়ে তাদের কাছ থেকে অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান পুনরায় সরকারী খাতে ফেরত নিয়েছে। এমন কি ইদানিং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়েছেন যে, আর কোনও বেসরকারীকরণ বা বিরাষ্ট্রীয়করণ করা হবে না। তাঁর এ ঘোষণাকে আমরা স্বাগত জানাই। সাথে সাথে আমরা বলতে চাই যে, বন্ধ ও চলমান সকল সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে চীনের অভিজ্ঞতার আলোকে লাভজনকভাবে চালানোর জন্যে যা যা করণীয় তা অতি দ্রুতই সুপরিকল্পিতভাবে করতে হবে। তা'ছাড়া নতুন নতুন খাতে সরকারকে বিনেয়োগ করতে হবে। কারণ আমাদের দেশের ব্যক্তিগত খাত ল্যাপটপ, মোবাইলসহ আইসিটি খাতে কিন্তু এতদিনেও বিনিয়োগে এগিয়ে আসেনি। তারা বরং আমদানী ব্যবসা করতে উৎসাহী। ২০১০ সালে টংগী টেলিফোন শিল্প সংস্থায় সরকার দেশীয় ব্রান্ডের ল্যাপটপ ও মোবাইল উৎপাদনের প্রকল্প হাতে নেয়। কিন্তু দেখা গেল ব্যক্তিগত খাতের ব্যবসায়ী তথা কমিশনভোগী কায়েমী স্বার্থের কাছে সরকার নতি স্বীকার করে উৎপাদন কর্মকান্ড বন্ধ করে দেয়। সম্ভবতঃ ওখানে সামান্য তহবিল যোগান দেয়ার ব্যাপার ছিল। আমরা তখন বাজেট আলোচনায় এ ধরণের তহবিলের ব্যবস্থা করার জন্যে সরকারের কাছে আবেদন রেখেছিলাম। অর্থমন্ত্রী মহোদয় আমাদের কথায় কর্ণপাত করেন নি। আমার বিশ্বাস এ প্রকল্পে ১০০ কোটি এমন কি প্রয়োজনে ১০০০ কোটি টাকা দেয়া উচিত। কারণ দেশীয় ব্রান্ড বলে কথা। এ কাজে ১০০০ কোটি দিলে বিদেশী মুদ্রায় অন্ততঃ ২০,০০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হোত। কমিশন বাণিজ্য ও চোরা কারবারীর মত অপরাধগুলো থেকে দেশ অনেকাংশে মুক্ত থাকতো বৈ কি। আমি মনে করি সরকারকে এ বিষয়ে জরুরী ভিত্তিতে পদক্ষেপ নিতে হবে। শুধু টংগীতে নয়, প্রাথমিকভাবে সকল বিভাগীয় শহরে এবং পরবর্তীতে বৃহত্তর জেলা শহরে ল্যাপটপ ও মোবাইল সংজোযনের কারখানা গড়ে তুলতে হবে।

আমরা গড়ে তুলেছি রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল। আর চীনারা গড়ে তুলেছে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল। এ দু'য়ের মধ্যে পরিমাণগত ও গুণগত পার্থক্য রয়েছে। রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে শুধু রপ্তানীর জন্যে উৎপাদন করা হতো। প্রথম দিকে এখানে উৎপাদিত পণ্য অভ্যন্তরীণ বাজারে বিক্রয় করা নিষিদ্ধ ছিল। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায়

এসে আভ্যন্তরীণ বাজারে অন্তত: ৪০% পণ্য বিক্রি করা যাবে মর্মে সিদ্ধান্ত নেয়। কর মুক্তি, শুল্ক রেয়াত ইত্যাদি নানা ধরণের সুবিধাদি এখানে বিনিয়োগকারীদের দেয়া হয়। অপরদিকে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার ভৌগলিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় নেয়া হয়। বৈশিষ্ট্যসমূহকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগানো হয়। কোনও রকম কর ও শুল্ক রেয়াদ দেয়া হয় না। অর্থাৎ চীনারা কোনও রকম কর বা শুল্ক রেয়াদ দেয় নি। "ওয়ান স্টপ" সার্ভিস দিয়েছে তারা। প্লটসহ যাবতীয় সেবাসমূহ তারা এ "ওয়ান স্টপ" সার্ভিস সেন্টার থেকে দিয়েছে। ফলে তারা বিনিয়োগ নিয়ে কুলোতে পারে নি। অপর দিকে এত এত রেয়াদ দেয়া সত্ত্বেও আমরা কাংখিত বিনিয়োগ পাইনি একমাত্র প্লটসহ যাবতীয় সেবা প্রদানে দীর্ঘ সূত্রীতা ও দুর্নীতির কারণে (ঘুষ ছাড়া কোনও সার্ভিস না পাওয়া)। আশির দশকের গোড়ার দিকে চীনারা উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলের অঞ্চলগুলোতে মোট ১৪টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলে। এগুলো খুবই সফল হলে তারা নব্বই এর দশকে মধ্য ও উত্তরাঞ্চলে তা ছড়িয়ে দেয়। বর্তমানে তারা দুর্গম ও পশ্চাদপদ তিব্বত অঞ্চলেও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা শুরু করেছে। ভারতও চীনের এ সফলতায় উৎসাহিত হয়ে গোটা ভারতবর্ষব্যাপী ১০০ এর মত বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার এক উচ্চাকাংখী কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। আমার বিশ্বাস আমাদের দেশেও অঞ্চলভিত্তিক ভৌগলিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় নিয়ে দ্রুতই বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলতে হবে। চীনের আদলে আধুনিক অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা গড়ে তুলতে হবে এবং "ওয়ান স্টপ" সেবা চালু করতে হবে। গোটা প্রক্রিয়াকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে হবে। তা'হলে আর রেয়াত, প্রণোদনা দেয়ার প্রয়োজন হবে না।

পোষাক শিল্প আমাদের ভবিষ্যত নয়। হাই টেক্ প্রোডাক্ট হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যত। অর্থাৎ মূল্য সংযোজনের সুযোগ বেশী এ ধরণের শিল্পায়নে যেতেই হবে আমাদেরকে। সরকারী ও ব্যক্তিগত এ দু'খাতেই ক্ষুদ্র ও ভারী যন্ত্রপাতি, গাড়ি-বাস, লোকোমটিভ-ওয়াগন, কম্পিউটার-ল্যাপটপ, ফোনসেট-মোবাইল ইত্যাদি শিল্প কারখানা গড়ে তুলতে হবে। সর্বোপরি টেক্সই শিল্পোন্নয়নের জন্যে অবশ্যই শিক্ষার সঙ্গে উৎপাদনের সরাসরি সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে যা চীনারা অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে করতে পেরেছে। চীনারা সারা দেশব্যাপী উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর খোল্-নল্চে পাল্টে ফেলেছে, গড়ে তুলেছে অসংখ্য বিশ্ব মানের গবেষণাগার। আর এ কারণেই তারা স্বল্প সময়ের ব্যবধানে নিজ ব্রান্ডের পণ্য নিয়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ করছে। মেধাসত্ত্ব ও প্যাটেন্টের ক্ষেত্রে চীনারা বিশ্বে এখনই তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে। একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের পরেই তাদের স্থান। আর তাই চীনাদের পূর্বের 'মেড ইন চায়না'এর সাথে আরেকটি স্লোগান যুক্ত হয়েছে : "ডিজাইন্ড ইন চায়না" অর্থাৎ শুধু চীনে প্রস্তুতকৃত নয়, চীনে আবিষ্কৃতও বটে। আমাদেরকে শিল্পায়নে গবেষনার উপর অধিক গুরুত্ব দিয়ে উৎপাদনের সাথে শিক্ষার সরাসরি সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। নিজস্ব ব্রান্ডের পণ্য নিয়ে দেশীয় ও বিদেশী বাজারে প্রবেশ করতে হবে। ওদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী 'মেক ইন ইন্ডিয়া' স্লোগান নিয়ে যাত্রা শুরু করেছেন। অর্থাৎ ভারতে বানাও বা তৈরী কর। এর দ্বারা তিনি মূলত: বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে চাইছেন। আমরাও তা চাই। কাজেই আমাদের স্লোগান এক্ষেত্রে হবে তিনটি: "মেক ইন বাংলাদেশ", "মেড ইন বাংলাদেশ" এবং "ডিজাইন্ড ইন বাংলাদেশ"।

সরকারী খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে সরকারকে অবশ্যই সহযোগিতা দিতে হবে। আমরা মনে করি সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠাণগুলোর কেনা-কাটার ক্ষেত্রে সরকারী খাতের শিল্পজাত পণ্যকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। প্রয়োজনে আইন করে বাধ্যতামূলক করে দিতে হবে। খাদ্য শস্যসহ বেশ কিছু পণ্য মোড়কীকরণের ক্ষেত্রে সরকার ইতোমধ্যেই পাটজাত ব্যাগ ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেছে বটে, তবে এখনও তা পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয় নি। এটা বাস্তবায়নে অবশ্যই সরকারকে আন্তরিক এবং আরও তৎপর হতে হবে। পরিবেশ ও পাট খাতের স্বার্থে সরকারকে অবশ্যই এটা বাস্তবায়ন করতে হবে।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন

অবকাঠামো প্রধানত: ২ ধরণের : ক) অর্থনৈতিক অবকাঠামো এবং খ) সামাজিক অবকাঠামো। আমরা এখানে মূলত: অর্থনৈতিক অবকাঠামো নিয়ে কথা বলবো। অর্থনৈতিক অবকাঠামোকে সাধারণত: মানবদেহের রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়ার সাথে তুলনা করা হয়। মানবদেহে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া কোনও কারণে বাধাগ্রস্থ হলে মানুষ যেমন রুগ্ন হয়ে পড়ে, অচল হয়ে যায়, ঠিক তেমনিভাবে অর্থনৈতিক অবকাঠামো সেকেলে হলে, রুগ্ন হলে, ভঙ্গুর হলে অর্থনীতির স্বাস্থ্যও ভঙ্গুর বা রুগ্ন হতে বাধ্য। অর্থনৈতিক অবকাঠামোর মধ্যে আবার পরিবহন অবকাঠামো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আর এক্ষেত্রে আমাদের দেশে একটা নৈরাজ্যজনক অবস্থা বিরাজ করছে। এ অবস্থা থেকে আমাদেরকে অবশ্যই পরিত্রাণ পেতে হবে। কারণ তা না হলে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ বাধাগ্রস্থ হবে এবং সরকারের সুষম উন্নয়নের স্বপ্ন, সোনার বাংলা গড়ার

স্বপ্ন কল্পনাই থেকে যাবে। স্থল পরিবহণ বিশেষ করে রেল ও সড়ক পরিবহণ সম্পর্কে ইতোমধ্যেই কিছুটা আলোচনা আমরা করেছি। এখানে তাই সেসম্পর্কে আর পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। এখানে নৌ পরিবহণ নিয়ে কিছু কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি। প্রকৃতি নিজ হাতে আমাদেরকে ২৪ হাজার কিলোমিটার নদী বানিয়ে দিয়েছে। অথচ সেগুলো অযত্ন ও অবহেলায় প্রায় সবটাই হয় মরে গেছে , না হয় মৃত্যুর কাছাকাছি আছে। এর মধ্যে এখনও পর্যন্ত সারা বছর নাব্য থাকে এমন নদীর দৈর্ঘ্য মাত্র সাড়ে তিন হাজার কিলোমিটার (১৪,১৫,১৬,১৭,১৮,১৯,২০)। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আমাদের নদীগুলো অধিকাংশ স্থানেই প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রশস্ত। এছাড়া রয়েচে অসংখ্য বাক। এগুলো কমিয়ে নদীগুলোর প্রশস্ততা হ্রাস করে একদিকে যেমন বিপুল পরিমাণ জমি (কম পক্ষে মিলিয়ন হেক্টর) উদ্ধার করা সম্ভব, ঠিক তেমনি নদীগুলোর ভাঙ্গন রোধ করে নৌ পরিবহণের গতি বৃদ্ধি করা সম্ভব। আর একটা কথা নদীর দু' তীর কংক্রিটে বাধাই করে দিতে হবে যা অবশ্যই একটা দীর্ঘ মেয়াদী বিষয়। ভুললে চলবে না যে, নদী আমাদের অর্থনীতির জীবন। ২৪ হাজার কিলোমিটার নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে পারলে আমরা অবশ্যই দেশকে বন্যামুক্ত রাখতে সক্ষম হবো। এটাও অবশ্যই একটা দীর্ঘ মেয়াদী ব্যাপার। তবে কাজটি এখনই শুরু করা আবশ্যক। আমি আমার ইতোপূর্বেকার অনেক লেখায় বলেছি এবং আজকে আবার বলছি যে, "নদী ব্যবস্থাপনা ও নদী খনন মন্ত্রণালয়" এ নামে একটি মন্ত্রণালয় এখনই সৃষ্টি করা হোক। এটা সময়ের দাবী। এতে যা খরচ হবে তার তুলনায় আমাদের অর্থনীতির উপকার হবে লক্ষ গুণ। আমি মনে করি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত তহবিলের একটা বড় অংশ এখানে খরচ করা উচিত।

এবারে বিমান পরিবহণ সম্পার্কে দু'একটি কথা বলতে চাই। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে সাথে অন্যান্য পরিবহণ মাধ্যমের মত বিমান পরিবহণেরও চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু আমাদের কি আন্তর্জাতিক মানের বিমানবন্দর আছে? নাই ! কারণ আমাদের রাষ্ট্রের পরিচালকরা ও নীতি নির্ধারকরা স্বল্প মেয়াদী সমাধানে বিশ্বাসী। কিন্তু আমি মনে করি যে, আমাদেরকে অবশ্যই দীর্ঘ মেয়াদে পরিবহণ চাহিদা নিয়ে ভাবতে হবে: ১০০-২০০ বছরে এ চাহিদা কোথায় গিয়ে ঠেকবে বা দাঁড়াবে তা মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার মতে ঢাকার উপকণ্ঠে অন্ত তঃ ২টি (দক্ষিণে ও পশ্চিমে), ৭টি বিভাগীয় শহরের উপকণ্ঠে ৭টি, পর্যটন শহরকেন্দ্রীক আরও কয়েকটি বিমান বন্দর নির্মাণের পরিকল্পনা এখনই গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, বিমান বন্দরগুলো শহরকেন্দ্র থেকে ৩০-৪০ কিলোমিটার দূরে হওয়া বাঞ্চনীয়। উৎকৃষ্ট জমি বাঁচানো ও শব্দ দূষণ থেকে সুরক্ষা পাওয়ার স্বার্থে প্রস্তাবিত বিমানবন্দরগুলো পারতপক্ষে নদীর চরে নির্মাণ করা ঠিক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। অবশ্যই এগুলোর সাথে রেল, সড়ক ও নৌ পথের সুসমন্বয় থাকতে হবে।

আরেকটি কথা বলা এখানে জরুরী মনে করছি। আর তা হলো এই যে, উপরে বর্ণিত পরিবহণ মাধ্যমগুলোর জন্যে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির জন্যে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, একাডেমী, বিশ্ববিদ্যালয় বা অনুষদ গড়ে তুলতে হবে। দীর্ঘ মেয়াদে এগুলোর প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র ইত্যাদি দেশে উৎপাদনের কথাও আমাদেরকে ভাবতে হবে। সরকারী-বেসরকারী দু'খাতেই এটা হতে পারে। ভূয়া ড্রাইভিং লাইসেন্স সমস্যা সমাধানের জন্যে সম্পূর্ণ পৃথক ও অত্যন্ত শক্তিশালী লাইসেন্সিং অথরিটি গঠন করতে হবে। এতে বিশেষজ্ঞসহ বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সব জেলাতে এর শাখা থাকবে, তবে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহীতে একাধিক কেন্দ্র থাকতে পারে। আর দুর্ঘটনা রোধে সকল ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় অনবরত ট্রাফিক আইন সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন উদ্ভাবন ও প্রচারনা চালাতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে সরকার এটা বাধ্যতামূলক করে দিতে পারে।

শিক্ষার বিকাশ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন

অবশেষে ২০১০ সালে আমরা একটা যুগোপযোগী শিক্ষানীতি পেয়েছি। অবশেষে এ জন্যে বলছি যে, ইতোপূর্বে বঙ্গবন্ধুর আসলে ১৯৭৩ সালে শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করা হয়েছিল ড: কুদরত-ই-খোদার নেতৃত্বে গঠিত আমাদের দেশের ১ম শিক্ষা কমিশনের সহায়তায়। এ শিক্ষানীতিতে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। এতে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত করা হয়েছিল যাকে ফাংশনাল এডুকেশন নামে অভিহিত করা হয়েছিল। এ শিক্ষানীতিতে বৈষম্যহীন এবং সাম্প্রদায়িকতামুক্ত শিক্ষার কথা বলা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু এ শিক্ষা নীতি বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঘাতকরা তাঁকে সে সুযোগ দেয় নি। জিয়া ক্ষমতা দখল করে অন্যান্য অনেক কিছুর মত এ শিক্ষা নীতিকে নির্বাসনে পাঠান। তারপর বহু শিক্ষা কমিশন হয়েছে। কিন্তু তা কখনও আলোর মুখই দেখে নি, বাস্তবায়ন তো দূরের কথা। একমাত্র ২০০৯ সনে মহাজোট সরকার ক্ষমতায় এসে আধুনিক যুগোপযোগী এক শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করে যা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ শিক্ষা নীতিতে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছুটা অসংগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। সরকার প্রত্যেকটি জেলায় কমপক্ষে

একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রত্যেকটি উপজেলায় অন্তত:পক্ষে একটি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে যার বাস্তবায়ন ইতোমধ্যেই অনেকটা এগিয়েছে। কিন্তু বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে তেমন তৎপরতা চোখে পড়ছে না। এ ক্ষেত্রে যুব উন্নয়ন কেন্দ্রসহ পূর্বের কিছু সংখ্যক প্রতিষ্ঠানেই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলছে। আমি মনে করি যে, এ কর্মসূচী বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন। আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে : আমাদের দেশের সাড়ে চার হাজার ইউনিয়ন পরিষদের কেন্দ্রে একটি করে মোট সাড়ে চার হাজার বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। শহর এলাকায় ইতোমধ্যেই বেশ কিছু প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে। প্রয়োজনে আরও স্থাপন করা যেতে পারে। নার্সিং, প্যারা মেডিক্যাল, মেডিক্যাল টেক্নোলজি ইন্সটিটিউট যেমন আরও স্থাপন করতে হবে ঠিক তেমনিভাবে রেল, নৌ ও সমুদ্র পথের জন্যে জনশক্তি প্রশিক্ষণ একাডেমি, ইন্সটিটিউট, বিশ্ববিদ্যালয়, অনুষদ ইত্যাদি জরুরী ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে। আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন শাখাগুলোর উপর নতুন নতুন বিভাগ, অনুষদ খুলতে হবে। মোট কথা আমাদের বিপুল জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রুপান্তরিত করার জন্যে দেশব্যাপী বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-কারিগরি-বৃত্তিমূলক শিক্ষার এক সুসমন্বিত নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে। জমি বাঁচানোর তাগিদে আমাদের দেশের সকল স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দুই শিফ্ট প্রয়োজনে তিন শিফ্ট চালু করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কিছু ইন্‌ভেন্টরিসহ ২০ - ৩০% অতিরিক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ দিলেই চলবে বলে আমরা মনে করি।

সরকার গবেষণা কার্যক্রমের উপর গুরুত্ব দিচ্ছে। এটা শুভ লক্ষণ। শিক্ষা নীতিতেও গবেষণার কথা বলা হয়েছে। আমরা মনে করি যে, টেক্সই উন্নয়নের জন্যে গবেষণা অপরিহার্য। চীনাদের মত আমাদের দেশের বিদ্যমান গবেষণাগারগুলোর খোল্-নল্চে পাল্টে ফেলতে হবে। বসাতে হবে সর্বাধুনিক সব যন্ত্রপাতি। একই সাথে সর্বশেষ প্রযুক্তিনির্ভর আরও নতুন নতুন গবেষণাগার গড়ে তুলতে হবে। উৎপাদনের সাথে গবেষণার সরাসরি সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। অনুৎপাদনশীল খাতসমূহে বরাদ্দ হ্রাস করে গবেষণা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মহাজোট সরকারের বিগত আমলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল শিক্ষকদের জন্যে পৃথক এবং উচ্চতর বেতন কাঠামো প্রদান করার। কিন্তু সরকার সে প্রতিশ্রুতি থেকে সরে গেছে বলে এখন মনে হচ্ছে। স্বৈরাচার বুঝতে অক্ষম, কিন্তু একটা গণতান্ত্রিক সরকার কেন এ সত্যটি বুঝতে পারছে না যে, মানুষ গড়ার একজন কারিগরকে যদি হাড়ির চিন্তা করতে হয় তা'হলে সে ভাল পড়াতে-শেখাতে পারে না; তাকে টিউশনি তথা কোচিং বাণিজ্যের কথা ভাবতে হয় বৈ কি। আমরা মনে করি যে, মানুষ গড়ার কারিগরদের জন্যে উচ্চতর বেতন কাঠামো দেয়া হোক এবং কোচিং-টিউশানি চিরতরে বন্ধ করে দেয়া হোক। ভারত সরকার (বিগত বিজেপি সরকার) এটা বহু পূর্বেই করেছে। আমলারা তখন সর্বোচ্চ বেতনের দোহাই দিয়ে বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছিল। গণতান্ত্রিক সরকার তখন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে বিভিন্ন ভাতার আকারে শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করে নতুন উচ্চতর বেতন কাঠামো বাস্তবায়ন করেছে। উপমহাদেশে এমন কি শ্রীলংকা ও পাকিস্তানও শিক্ষকদের জন্যে পৃথক ও উচ্চতর বেতন কাঠামো বাস্তবায়ন করেছে। আমাদের দেশেও একমাত্র গণতান্ত্রিক সরকারই এটা করতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমলারা বা অন্যান্য পেশার লোকজন বাধা দিলে সরকারকে তা মোকাবেলা করেই এগোতে হবে। তাদেরকে বোঝাতে হবে যে, তারাও শিক্ষকদের কাছেই লেখা-পড়া শিখে মানুষ হয়েছেন, জ্বীন-ভূতের কাছে নয়। সরকারের দৃঢ় অবস্থানই এক্ষেত্রে অপরিহার্য ও প্রত্যাশিত পরিবর্তন আনতে পারে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন যাবৎ দুর্নীতির মচ্ছব চল্ছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা এখন প্রায়ই ঘটতে দেখা যাচ্ছে। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঘুষের বিনিময়ে চাকুরী প্রদানসহ হেন কাজ নেই যেখানে ঘুষ দিতে হয় না। সরকার নিয়োগের জন্যে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যে পৃথক কমিশন গঠন করতে চেয়েছিল। কিন্তু কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহল তা ভন্ডুল করে দেয়। এ ক্ষেত্রে আমলা-শিক্ষক-রাজনীতিবিদ এ রকম একটা অসৎ চক্র কাজ করছে বলে আমাদের কাছে প্রতিয়মান হয়েছে। আমরা মনে করি যে, একটি সত্যিকারের গণতান্ত্রিক সরকার কারও অন্যায্য আবদার মেনে নিতে পারে না; কোনও কায়েমী স্বার্থের কাছে নতি স্বীকার করতে পারে না। শিক্ষা ব্যবস্থায় জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার স্বার্থে যা যা করা দরকার সরকার তা করবে জনগন এটাই প্রত্যাশা করে। এ ক্ষেত্রে শৈথিল্যের কোনও অবকাশ নেই। একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকরণে এর কোনও বিকল্প থাকতে পারে না।

টেক্সই উন্নয়ন ও পরিবেশ

প্রকৃতি প্রদত্ত্ব সম্পদের যুক্তিসম্মত অর্থনৈতিক ব্যবহার নিশ্চিত করার নামই হচ্ছে টেক্সই উন্নয়ন। টেক্সই উন্নয়ন বর্তমান ও ভবিষ্যত উন্নয়নের বিষয়টি বিবেচনা করে। আর উন্নত পরিবেশ টেক্সই উন্নয়নের ভিত্তি রচনা করে। কাজেই প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও লালন করা, আরও উন্নত করা, বৃদ্ধি করা আমাদের দেশের জন্যে আজ অত্যন্ত

জরুরী জাতীয় দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, একমাত্র দ্বীপ ও নগর রাষ্ট্র সিংগাপুর ছাড়া আমাদের দেশই পৃথিবীতে সবচেয়ে ঘন বসতির দেশ। ২০১১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী এখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৯৬৪ জন মানুষ বাস করে। স্বাক্ষরতার হার মাত্র ৫৭.৯% (১)। তার মানে ৪২.১% মানুষ ঠায় মূর্খ এবং যাদেরকে আমরা স্বাক্ষরতাসম্পন্ন বলছি তাদেরও একটা বড় অংশ প্রায় মূর্খ অথবা অর্ধশিক্ষিত; আধুনিক অর্থে এদেরকে শিক্ষিত বলা যায় না। জীবন- জীবিকার জন্যে এ বিপুল সংখ্যক মানুষের নানাবিধ অর্থনৈতিক কর্মকান্ড (বহুলাংশে অপরিকল্পিত ও অবিবেচনাপ্রসূত) এবং আমাদের সরকারগুলোর (অতীতের ও বর্তমানের) অত্যন্ত অপরিকল্পিত তথাকথিত উন্নয়ন কর্মকান্ডের কারণে আমাদের দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের অপূরনীয় ক্ষতি ইতোমধ্যেই হয়ে গেছে। মিষ্টি পানির জলাধারগুলোর অধিকাংশ মরে গেছে, পানি, বায়ু ও মাটি দূষিত হয়ে গেছে। বড় বড় বনাঞ্চল নি:শেষ হয়ে গেছে। বহু প্রজাতির উদ্ভিদ, গাছ-পালা, তরু-লতা ধ্বংস হয়ে গেছে। একই পরিণতি মৎস্য ও প্রাণিকূলের ক্ষেত্রে ঘটেছে। সুপেয় মিষ্টি পানির আধার আর অবশিষ্ট নেই। এমন কি মাটির নীচের জলধারগুলোও আর্সিনিকের বিষাক্ত উপাদানে দূষিত হয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা বিরাজ করছে আমাদের সবার প্রিয় রাজধানী ঢাকা মহানগর ও এর আশপাশের উপশহরগুলোতে। রাজধানীর চারদিকের নদীগুলো দখল-জবরদখলকারীদের আগ্রাসনে সরু খালে পরিণত হয়েছে। খালগুলো তো বহু পূর্বেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আর পানি দস্তুরমত আল্‌কাত্‌রার রূপ ধারণ করেছে। মৎস্যসহ সব ধরণের জলজ প্রাণি ও উদ্ভিদ বহু পূর্বেই অদৃশ্য হয়ে গেছে, পোকা-মাকড়ও ওখানে এখন আর দেখা যায় না। অথচ বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশকেও ওগুলোর পানি মৎস্যসহ বিভিন্ন জলজ প্রাণি ও উদ্ভিদে ভরপুর ছিল। ঐ শতাব্দীর আশির দশকে ব্যক্তিগত খাতে আবাসন শিল্পের বিকাশ তথা রিয়েল এষ্টেট ব্যবসা, ব্যক্তিগত ও সরকারী অপরিকল্পিত নানাবিধ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের কারণে ঢাকা বৈষম্যপূর্ণ, পুতি-দুর্গন্ধময়, নৈরাজ্যপূর্ণ এক অসুন্দর বাণিজ্যিক নগরীতে পরিণত হয়েছে। এখানে এখন আর কোনও আবাসিক এলাকা নেই। সর্বত্র এখন বাণিজ্য। প্রয়োজনের তুলনায় কম সড়ক (প্রয়োজন ২৫%, আছে মাত্র ৮%), সরু সড়ক, ক্ষুদ্র যানবাহনের আধিক্য, পাতাল রেল ও সুশৃংখল গণপরিবহণের অনুপস্থিতি, আধুনিক ফুটপাথ, পয়:নিস্কাষন ব্যবস্থা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অনুপস্থিতি আসলে মহানগরীকে মানুষের বসবাসের অনুপোযোগী ইতোমধ্যেই করে ফেলেছে। গুরুতর স্বাস্থ্য ঝুঁকীতে আছে এখানে বসবাসকারী প্রায় দেড় কোটি মানুষ। এ অবস্থা আর চলতে দেয়া যায় না। পরিত্রাণ জরুরী। উত্তরণ আমাদেরকে ঘটাতেই হবে। এ প্রসঙ্গে নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি আমি নীতি নির্ধারক সংশ্লিষ্ট মহলের তথা দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি :

১। পয়:প্রণালী (Sewerage line) এবং ফুটপাত সমন্বয় করে সাশ্রয়ী বিজ্ঞানসম্মত করতে হবে। অর্থাৎ গোটা পয়:প্রণালী সড়কের পাশ দিয়ে নিতে হবে এবং তার উপরে অন্তত: দেড়-দুই ফুট উচ্চতার স্লাব দিয়ে ফুট পথ গড়ে তুলতে হবে। এটা করলে রাস্তা খোড়াখুড়ি অনেকটাই বন্ধ হয়ে যাবে এবং মানুষ ফুটপথ ব্যবহারে অবশ্যই অভ্যস্ত হবে।

২। আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে। জৈব ও অজৈব বর্জ্যের জন্যে পৃথক ডাষ্টবিনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। অথবা একই ডাষ্টবিনের দু'টো মুখ থাকতে পারে : একটা দিয়ে জৈব ও অন্যটি দিয়ে অজৈব বর্জ্য ফেলার জন্যে। অবশ্যই ডাষ্টবিনের গায়ে এ সংক্রান্ত ষ্টীকার সেঁটে দিতে হবে। কোনও অবস্থাতেই ডাষ্টবিন উম্মুক্ত হবে না। অবশ্যই বদ্ধ সেফ্‌টি ডাষ্টবিনের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে কোনও প্রকার দুর্গন্ধ ছড়াতে না পারে। এ ছাড়াও প্রত্যেক পরিবারকে প্রতিদিন দু'টো করে পলিথিনের বড় কালো ব্যাগ সরবরাহ করা যেতে পারে : একটি জৈব ও অন্যটি অজৈব বর্জ্যের জন্যে। লন্ডন শহরে এ ধরণের ব্যবস্থা দীর্ঘদিন যাবৎ চালু আছে। লন্ডনের পাঁচ/ছয় বারের নির্বাচিত অত্যন্ত জনপ্রিয় মেয়র কেন লিভিং ষ্টোন এ ব্যবস্থাসহ আরও অনেক যুগান্তকারী ব্যবস্থা চালু করে গেছেন যার ফলে লন্ডন শহর আজকের অবস্থায় আসতে পেরেছে। বর্জ্য রিসাইকেল করার ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরী ভিত্তিতে করতে হবে। জৈব বর্জ্য থেকে বিদ্যুত ও সার উৎপাদিত হবে এবং অজৈব বর্জ্য থেকে রকমারী সব পণ্য উৎপাদিত হবে। এর ফলে গোটা মহানগরী বর্জ্যের ভাগার থেকে মুক্ত হবে, দুর্গন্ধমুক্ত হবে, পরিচ্ছন্ন হবে।

৩। লন্ডন শহরের আদলে গণশৌচাগার (পাবলিক টয়লেট) ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এটাও লিভিং ষ্টোনের সময়ে হয়েছিল। আমি মনে করি এ ধরণের গণশৌচাগার গড়ে তোলা ব্যতীত সম্পূর্ণ দুর্গন্ধমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন আধুনিক ঢাকা গড়ে তোলার স্বপ্ন শুধু কল্পনাই থেকে যাবে। আমার দেখামতে লন্ডনের মত এত সুন্দর ও কার্যকর গণটয়লেট ব্যবস্থা পৃথিবীর কোথাও নেই। কাজেই এক্ষেত্রে লন্ডনের অভিজ্ঞতা অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে।

৪। সড়কসমূহ যতটা সম্ভব প্রশস্ত করতে হবে। বিদ্যুতের খুঁটিগুলো মাঝখানে স্থানান্তর করতে হবে এবং সবচেয়ে ভাল হবে যদি তারগুলো সব মাটির নীচ দিয়ে টানা হয়। দীর্ঘ মেয়াদে এটা নিরাপদ ও সাশ্রয়ী হবে।

৫। খালগুলো অবশ্যই উদ্ধার করতে হবে। ওগুলো গভীর করে খননপূর্বক দু'তীর কংক্রীটে বাধাই করে দিতে হবে। এগুলোর সাথে পয়:প্রণালী ব্যবস্থার সংযোগপূর্বক সমন্বিত ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

৬। নদীগুলোর তীর মুক্ত করতে হবে যেকোন মূল্যে। ওগুলোরও দু'তীর কংক্রীটে বাধাইপূর্বক দুদৃশ্য ওয়াকওয়ে নির্মাণ করতে হবে। কোনক্রমেই ফেলে রাখা যাবে না, দীর্ঘসূত্রীতা এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে না। খালগুলোর সাথে সাথে নদীগুলোও গভীর করে খননপূর্বক সংযোগ প্রদানপূর্বক সুসমন্বিত এক নিস্কাষণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রেও আমি মনে করি লন্ডনসহ উন্নত আরও অনেক দেশের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে হবে। আর এটা করতে পারলেই রাজধানী শহরকে তার অত্যন্ত নাজুক ও ভঙ্গুর পয়:নিস্কাষণ ব্যবস্থা থেকে মুক্ত করা সম্ভবপর বলে আমি বিশ্বাস করি।

৭। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেশের সকল রেল ক্রসিং এ ওভারপাস নির্মাণ বাধ্যতামূলক করতে হবে। অতিঘন বসতির ঢাকায় এটা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করতে হবে জনগণের জানমালের নিরাপত্তার স্বার্থে।

৮। রাস্তা পারাপারের বা ক্রসিং এর জন্যে উন্নত দেশের আদলে অত্যন্ত সুপরিসর আন্ডারপাশ জরুরী ভিত্তিতে এবং সর্বত্র নির্মাণ করতে হবে। অবশ্যই অপরিকল্পিতভাবে নির্মিত অপরিসর ওভারব্রিজগুলো ভেঙ্গে দিতে হবে। তথাকথিত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও রেলওয়ে নির্মাণের কারণেও এগুলো সরাতে হবে বৈ কি!

৯। আমি বিশ্বাস করি যে, মেগা সিটি ঢাকার পরিবহণ সমস্যা সমাধানে দীর্ঘ মেয়াদে অবশ্যই কোলকাতার আদলে পাতাল রেল ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদী সমাধান তথা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও রেলওয়ে নির্মাণ খুব একটা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে বলে মনে হয় না। মনে রাখতে হবে ঘন বসতির এ দেশে পরিবহণ সমস্যার সমাধানে অবশ্যই দীর্ঘ মেয়াদী চিন্তা করতে হবে। এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য : কোন শহরের জনসংখ্যা মিলিয়ন হলেই সেখানে পাতাল রেল নির্মাণ করতে হবে এমর্মে একটি আইন করতে হবে। তা না হলে আমরা কখনই বিদ্যমান পরিবহণ নৈরাজ্য ও বিপুল অপচয় (মনুষ্য-ঘন্টা, জানমাল ইত্যাদির আকারে) থেকে রক্ষা পাব না।

১০। অর্থায়ন কীভাবে হবে? আমি মনে করি ইচ্ছা থাকলে অর্থায়ণ সমস্যা হবে না। রাজধানীর উন্নতি তথা গোটা দেশের উন্নতির বিষয়ে দলমত নির্বিশেষে আমাদের সকলের একমত হওয়ার সময় এসেছে। এ ব্যাপারে আমরা ঐক্যমত হতে না পারলে দেশের ভবিষ্যত অন্ধকারময় হবে এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই আমার। বলছিলাম যে, কর বৃদ্ধি করবো না, নতুন কর বসাবো না ইত্যাদি সব সস্তা সেকেলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গদি দখলের প্রতিযোগিতা থেকে আমাদেরকে অবশ্যই বেরিয়ে আসতে হবে। জনগণ চায় পরিচ্ছন্ন, সুস্থ, জঞ্জালমুক্ত, নৈরাজ্যমুক্ত পরিবেশ। অতএব, জনগণ করও দিবে। উন্নত সেবার বিনিময়ে উচ্চতর কর হার জনগণের মধ্যে এ সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। ব্যাংক হিসাব ও বিভিন্ন পরিবহণ মাধ্যমের টিকেটের উপর নির্দ্দিষ্ট পরিমান লেভী আরোপ করা যেতে পারে। তার মানে কর ও লেভী মিলে অর্থায়নের একটা গুরুত্বপূর্ণ উৎস হতে পারে। বিদেশী ঋণ ও অনুদান আর একটি উৎস হতে পারে। এছাড়া ব্যাংকগুলো সিন্ডিকেট করে অর্থায়নের আর একটি উল্লেখযোগ্য উৎস হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। আর একটা ব্যবস্থা হতে পারে যে, নির্দ্দিষ্ট চুক্তিতে বিদেশীদের বিশেষ করে চীনাদের দিয়ে দেয়া। তারা নির্মাণ করে নির্দ্দিষ্ট সময়ের আয়টা নিজেরা নিবে। এর পরে আমাদের সরকারকে বুঝিয়ে দিয়ে যাবে। অর্থাৎ তার পর থেকে আমরা মালিক হবো। অবশ্যই চুক্তি করার সময়ে লিজের সময়টা যতটা সম্ভব কমিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে। এ ধরণের চুক্তিতে চীনারা পৃথিবীর বহু দেশে কাজ করছে (শ্রীলংকা, বলিভিয়া, ভেনিজুয়েলা ইত্যাদি)।

১১। পরিকল্পনা কমিশনকে তার ১৯৭২ সালের মর্যাদায় পুন:প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এর খোল্-নল্‌চে বদলে ফেলতে হবে। দেশের সেরা বিশেষজ্ঞদের এখানে নিয়ে আসতে হবে। একে সম্পূর্ণরূপে আমলাতান্ত্রিকতামুক্ত করতে হবে। সকল বিভাগীয় শহরে এর শাখা খুলতে হবে এবং ওগুলোতেও বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ দিতে হবে। আমাদের দেশের সকল সম্পদের সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হলে এর কোনও বিকল্প নেই বলে আমি মনে করি।

১২। আমাদের প্রিয় রাজধানীকে সুষ্ঠু ও সুপরিকল্পিত রূপ দিতে হলে এর জন্যে দিল্লীর আদলে সিটি গভর্ণমেন্ট বা নগর সরকার গঠন করতে হবে। একই শহরে দু'টি সিটি কর্পোরেশন কোন সমাধান হতে পারে না। ঢাকা নগরীর সবকিছুর দায়িত্ব নগর সরকারের ব্যবস্থাপনায় দিতে হবে। এর থাকবে পৃথক পরিকল্পনা কমিশন। একজন মুখ্য মন্ত্রীর নেতৃত্বে ১০-১২ সদস্যের অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকারের মন্ত্রীসভা থাকবে। আধুনিক দক্ষ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে এটা আমাদের করতেই হবে। কাজেই যত আগে করবো ততোই মঙ্গল এ কথা মনে রাখতে হবে।

উপসংহার

গণতন্ত্র মানে শৃংখলা, কিছু বিধি-নিষেধ। গণতন্ত্র মানে আইনের শাসন। গণতন্ত্র উশৃংখলতা ও নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে। গণতান্ত্রিক দেশে যা খুশী তা করা যায় না। আমরা আমাদের দেশকে গণতান্ত্রিক দেশ বলে গর্ব করি। অথচ সাম্রাজ্যবাদীচক্র তথা বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের কুপরামর্শে বাজার অর্থনীতির নামে আমাদের দেশটাকে একটা নৈরাজ্যজনক অবস্থার মধ্যে ঠেলে দেয়া হয়েছে। কৃষি, শিল্প, পরিবহণ, ব্যাংক ব্যবস্থা, বাণিজ্য, শিক্ষা ব্যবস্থা সর্বত্র নৈরাজ্য। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ অত্যন্ত জরুরী। প্রশ্ন হচ্ছে: কীভাবে এবং কোন পথে? বাজার অর্থনীতির ধকল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ধারক-বাহক দেশগুলোই সহ্য করতে পারে নি। তারা সকলেই এক দীর্ঘমেয়াদী মহাসংকটে হাবুডুবু খাচ্ছে। এ সংকটের শুরু সেই ২০০৭ এর শেষ দিকে। বর্তমানে ইহা ৩য় স্তর অতিক্রম করছে। ১ম স্তরে আইসল্যান্ড, গ্রীস, আয়ারল্যান্ড, স্পেনসহ বেশ কিছু দেশ দেউলিয়া হয়ে যায়। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানী ও জাপান প্রায় দেউলিয়াত্বের কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। বাঁচার জন্যে তারা সকল ধরণের জনকল্যাণমূলক কর্মসূচী কাটছাঁট করেই ক্ষান্ত হয় নি, অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের পেনশন পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারী ছাঁটাই করেছে অত্যন্ত নির্দয় ও অমানবিকভাবে। বন্ধ করেছে উৎপাদন। পুঁজিবাদ তথা পুঁজিপতিদের বাঁচানোর জন্যে তথাকথিত বেলআউটের নামে জনগণের করের টাকা ঐ সকল দেশের সরকারগুলো তুলে দিয়েছে পুঁজিপতিদের হাতে। সর্বত্র নৈরাজ্য ও আস্থাহীনতা : কেউ কাউকে বিশ্বাস করছে না, ব্যক্তি ব্যাংককে এবং ব্যাংক ব্যাংককে, বীমা প্রতিষ্ঠানকে বিশ্বাস করছে না। ষ্টক মার্কেট ফেল। বিনিয়োগ হচ্ছে না। সুদ হার শূন্য করেও না। অনেকে ক্ষতি সহ্য করতে না পেরে আত্নহত্যার পথ বেছে নিয়েছে ও নিচ্ছে। বেকারত্ব বেড়েছে হু হু করে : যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানী ও জাপানে এ হার কম-বেশী ১০%। অন্যান্য দেশে আরও বেশী, স্পেন, পর্তুগাল ও গ্রীসে প্রায় অর্ধেক মানুষ বেকারত্বের শিকার। ১ম স্তরে প্রবৃদ্ধি ছিল ঋণাত্নক, ২য় স্তরে শূন্যের কোঠায়, বর্তমানে চলমান ৩য় স্তরে এসে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও তা টেক্‌সই হচ্ছে না। জাপানে তো আবার ঋণাত্নক প্রবৃদ্ধির মুখে প্রধানমন্ত্রী সিন্‌জো এ্যাবে সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে নির্বাচনে যেতে দস্তরমত বাধ্য হয়েছেন। ওদিক খনিজ সম্পদ রপ্তানীকারক দেশ অষ্ট্রেলিয়ার রপ্তানী হ্রাস পাওয়ায় প্রবৃদ্ধি কমে গেছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে বেকারত্ব (বর্তমানে প্রায় ৬.০%)। পুঁজিবাদী উন্নত দেশগুলোর এহেন দূরাবস্থার মধ্যেও আমাদের দেশ কিছুটা ভাল অবস্থানে আছে। অর্থাৎ প্রবৃদ্ধি ৬% এর উপরে ধরে রাখতে পেরেছে। এর কারণ সম্ভবত: এ সময়ে মহাজোট সরকারের ক্ষমতায় আসা; এ সরকারের ক্ষুদ্র-মাঝারী শিল্পবান্ধব ও দরিদ্রবান্ধব আর্থিক ও মুদ্রানীতি অনুসরন এবং সর্বোপরি পরিকল্পনায় ফিরে আসা; আন্তর্জাতিক ব্যাংক ব্যবস্থার সঙ্গে আমাদের দুর্বল সম্পর্ক এবং আমাদের রপ্তানী পণ্যের ধরন (পোষাক, পাদুকা, চিংড়ী ইত্যাদি অনেকটা কমদামী অত্যাবশ্যকীয় পণ্য উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর জন্যে)। অন্যদিকে চীনের প্রবৃদ্ধি কিন্তু এ সময়কালে ৭-৯% এর মধ্যেই ছিল। বিশ্ব বাজারের সাথে চীনের শক্ত সম্পর্ক থাকলেও সরকারের নিয়ন্ত্রিত বাজারনীতি ও সতর্ক আর্থিক ও মুদ্রানীতির কারণে তারা তাদের অর্থনীতিকে শুধু সংকটমুক্তই রাখে নি, প্রবৃদ্ধিও যথেষ্ট উচ্চ স্তরে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। চীন, ভিয়েতনাম, বাইলো রাশিয়া বাজার সংস্কার করছে ঠিকই; কিন্তু এ দেশগুলো বাজারের অদৃশ্য শক্তির কাছে পুরোপুরি আত্নসমর্পণ করে নি, পরিকল্পনাকেও নির্বাসনে পাঠায় নি। তারা পরিকল্পনার সংস্কার করে নিয়ন্ত্রিত বাজার ব্যবস্থার সাথে সমন্বিত করেছে সকল উৎপাদন সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর স্বার্থে। রাষ্ট্রীয় তথা সমাজতান্ত্রিক খাতের উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলোকে আধুনিকায়ণ করে বাজারের সাথে সমন্বিত করেছ। এটা তারা করেছে দেশীয় অর্থনৈতিক দর্শন অনুসরণ করে। অর্থাৎ দেশের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য, বাস্তবতা যা চায় তাই করেছে তারা। আমাদের দেশেও আমি মনে করি বাজারকে পরিকল্পিত ও নিয়ন্ত্রিতভাবে কাজে লাগাতে হবে। চীন ও ভিয়েতনামের আদলে সরকারী খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কারপূর্বক আধুনিকায়নের মাধ্যমে লাভজনক করতে হবে। মনে রাখতে হবে : বেসরকারী খাতের নৈরাজ্য, লাটি-ফুন্ডি চরিত্র ও সিন্ডিকেট বন্ধ এবং ধ্বংস করতে হলে আমাদের দেশেও একটি অত্যন্ত শক্তিশালী সরকারী খাতের উপস্থিতি অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিল্পের আধুনিক ও সম্ভাবনাময় খাতগুলোতে রাষ্ট্রকে বিনিয়োগে এগিয়ে আসতে হবে। বাস্তবতা আমাদেরকে এ শিক্ষাই দিয়েছে বলে আমি মনে করি। ধার করা পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী তত্ত্ব দিয়ে রূপকল্প ২০২১ এবং উন্নত দেশের স্বপ্ন ২০৪১ কখনই বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। অর্থনীতি সমিতির মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড: আবুল বারকাতের সাথে আমিও এ ব্যাপারে একমত পোষন করি যে, রূপকল্প ও জাতির পিতার সোনার বাংলা তথা উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দিতে হলে দেশীয় অর্থনৈতিক দর্শনের (Home Grown Economic Philosophy) কোনও বিকল্প নেই। সরকারের নীতি নির্ধারক মহল আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির টেক্‌সই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে বিষয়টি বিবেচনায় নিবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

গ্রন্থপঞ্জী :

১। অর্থ মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৩।
২। MOF, Goverment of the People's Republic of Bangladesh : Bangdesh Economic Review 2012.
৩। Planning Commission, MOP, Govenment of the People's Republic of Bangladesh : 6th Five Year Plan 2011 - 2015 .
৪। Planning Commission, MOP, Govenment of the People's Republic of Bangladesh : 5th Five Year Plan 1997 – 2002.
৫। Planning Commission, MOP, Govenment of the People's Republic of Bangladesh : 1st Five Year Plan 1973 - 1978.
৬। পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার : রূপকল্প ২০২১ - বাংলাদেশের প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০ - ২০২১।
৭। Planning Commission, MOP, Govenment of the People's Republic of Bangladesh : Vision 2021 – Perspective Plan of Bangladesh 2010 – 2021.
৮। Planning Commission, MOP, Govenment of the People's Republic of Bangladesh : Capacity Building Strategy for Climate Mainstreaming.
৯। বারকাত আবুল (২০১৪) : "অর্থনীতি শাস্ত্রের বিকাশ ও নব্য-উদারবাদী মতবাদ : দর্শনের দারিদ্র্য প্রসঙ্গে"। সম্মেলন বক্তৃতা, ১ম দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন, দর্শন অ্যালামনাই এসোসিয়েশন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
১০। বারকাত আবুল (২০১৪) : "বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতি : কাঠামোগত বিষয়াদি ও উত্তরণ সম্ভাবনা"। শহীদ ডঃ শামসুজ্জোহা স্বারক বক্তৃতা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
১১। বারকাত আবুল (২০১৪) : "বাংলাদেশের দারিদ্র্য - বৈষম্য - অসমতা : একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে"। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত "লোক বক্তৃতা ২০১৪," সিনেট ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১২। বায়েস আবদুল ও হোসেন মাহবুব (২০০৭) : "গ্রামের মানুষ গ্রামীণ অর্থনীতি"। রাইটার্স ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, স্বরাজ প্রকাশনী, ঢাকা।
১৩। সাহা সনৎ কুমার (২০১৪) : "আর্থ-সামাজিক বাংলাদেশঃ ভাবনা - দুর্ভাবনা"। অধ্যাপক মুশাররফ হোসেন স্মারক বক্তৃতা ২০১৪, সিনেট ভবন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
১৪। Khan M.M.H. (2012) : "Roads and Railways Sub–sectors in the Sixth Five Year Plan of Bangladesh : A Comparative Review". Bangladesh Journal of Political Economy, vol. 27, Nos. 1 & 2, 2011.
১৫। Khan M.M.H. (2011) : "Transport Sector in the Sixth Five Year Plan of Bangladesh : An Overview". Bangladesh Journal of Political Economy, vol. 27, Nos. 1 & 2, 2011.
১৬। Khan M .M.H. (2010) : Political Economy of Transit : Benefits for Bangladesh. Bangladesh Journal of Political Economy, vol. 26, Nos. 1, 2010.
১৭। খান মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন (২০০৮) : "বাংলাদেশের পরিবহণ অবকাঠামো উন্নয়নে নৌ-পরিবহণের ভূমিকা"। Bangladesh Journal of Political Economy, vol. 24, Nos. 1 & 2, 2008.
১৮। খান মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন (২০০৬) : "দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্র - বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূরীকরণের আরও একটি ব্যর্থ প্রয়াস"। Bangladesh Journal of Political Economy, vol. 23, Nos. 1 & 2, 2006.
১৯। খান মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন (২০০৬) : "ট্রানজিট ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন : প্রেক্ষিত দক্ষিণ এশিয়া"। Bangladesh Journal of Political Economy, vol. 23, Nos. 1 & 2, 2006.
২০। খান মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন (২০০৫) : "বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নয়নে বাংলাদেশ

রেলওয়ে: সমস্যা ও সম্ভাবনা" । Bangladesh Journal of Political Economy, vol. 22, Nos. 1 & 2, 2005.

২১ । খান মো: মোয়াজ্জেম হোসেন (২০০০) : "বাংলাদেশের বিদ্যুতায়ন : সমস্যা ও সম্ভাবনা" । আই.বি.এস.জার্নাল, সংখ্যা, ১৪০৬:৭, এপ্রিল ২০০০, ইন্সটিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ।

২২ । Khan M.M.H. (1998) : "Role of the Power Sector in the Development of Economic Infrastrcture of Bangladesh". Bangladesh Journal of Political Economy, vol. XIV, Nos. 2, 1998.

২৩ । Khan M.M.H. (1995) : "Economic Role of the State in the Developing World - The Bangladesh Case". Bangladesh Journal of Political Economy, vol. XIII, Nos. 1, 1995.

২৪ । Khan M.M.H. (1995) : "Rationale of De–emphasization of the Role of Government in the Economic Development of Bangladesh". Bangladesh Journal of Political Economy, vol. XIII, Nos. 2, 1995.

২৫ । Khan M.M.H. (1994) : "The City as a Socio–economic System". Rajshahi University Studies, Part – C, vol. II, Nos. 1, 1994.

২৬ । Khan M.M.H. (1992) : "The Silent Revenge : An Inquiry into the Causes of Economic Prosperity of Japan". The Journal of Social Sciences, University of Rajshahi, vol. II, Nos. 2, 1992.

২৭ । Khan M .M.H. (1990) : "Basic Needs and the Question of Distribution of National Income in Bangladesh". Bangladesh Journal of Political Economy, vol. X, No. 3, 1990.

২৮ । Khan M.M.H. (1990) : "Strategy of Socio–Economic Development for Bangladesh". Bangladesh Economic Studics, Department of Economics, University of Rajshahi, vol. 7, Nos. 1&2, 1990.

২৯ । Khan M.M.H. (1989) : "Urbanization in Bangladesh : A Socio–economic Analysis". The Journal of the Bangladesh National Geographical Association, vol. 17, Nos. 1&2, 1989.

৩০ । দৈনিক সমকাল ।

৩১ । দৈনিক জনকণ্ঠ ।

৩২ । The Daily Star.

৩৩ । দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন ।

৩৪ । শিল্প মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০১০) : "জাতীয় শিল্পনীতি - ২০১০" ।